।।কথামুখ।।

১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর। বাঙালি জাতির শোকতপ্ত দিন। কলকাতায় সেদিন শতসহস্র মানুষ অতি প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান করেছে। অগণিত মানুষ যোগ দিয়েছে বিডন স্ট্রিটের এবং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের সেনট্রাল কলেজের সভায়। রাখীবন্ধনের প্রীতিস্পর্শে তারা আবেগাপ্লুত। সকাল বেলার এই দু'টি সভায় ভাষণ দিয়েছেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। বিকাল বেলায় আপার চিৎপুর রোড-এঅনুষ্ঠিত হয় ফেডারেশণ হল -এর উদ্‌বোধনী সভা। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ইনডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আনন্দমোহন বসু। অখণ্ড অবি ভাজ্য বঙ্গদেশে এক নতুন জাতি (a new nation) জন্ম নিল, একথা তিনি জানালেন সভাপতির ভাষণে। এই সভায় কোন প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। আশুতোষ চৌধুরী সভার প্রারম্ভে ইংরেজি ভাষায় লেখা একটি ঘোষণাপত্র পাঠ করলেন।

‸hereas the Government has thought fit to effectuate the Partition of Bengal in spite of the Universal protest of the Bengalee nation, we hereby pledge and Proclaim that we as a people shall do everything in our power to counteract the evil effects of the dismemberment of our province, and to maintain the integrity of our race. God help us.

A.M. Bose

এই ঘোষণাপত্রের বাংলা অনুবাদ পাঠ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যেহেতু সমগ্র বাঙালী জাতির ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ সত্ত্বেও সরকার বঙ্গদেশকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা সমুচিত বলে স্থির করেছেন, সেইহেতু আমরা এতদ্বারা অঙ্গীকার করে ঘোষণা করছি যে, আমাদের প্রদেশের পক্ষে অনিষ্টকর এই অঙ্গচ্ছেদ প্রতিহত করে আমাদের জাতীয় একতাকে অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে আমরা জাতি হিসাবে আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করব। ভগবান আমাদের সহায় হোন।

ইংরেজি ঘোষণাপত্রে 'the Bengalee Nation' এবং 'Our rece' শব্দগুলি ব্যবহার কর হয়েছে। বাংলা অনুবাদে 'বাঙালী জাতি' এবং 'আমরা জাতি' শব্দগুলি পাই। অর্থাৎ nation এবং race উভয় অর্থেই 'জাতি' শব্দটি স্বীকৃত। প্রশ্ন জাগে, নেশন অর্থে সত্যিই কি বাঙালি একটি জাতি? ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সত্যিই কি জাতি অর্থাৎ নেশন হিসাবে বাঙালির নবজন্ম ঘটেছিল? বাঙালি জাতীয়তাবাদ কি নিছক কল্পনাপ্রসূত মতাদর্শ নয়? জাতীয়তাবাদ (Nationalism) নিঃসন্দেহে পশ্চিমি মতাদর্শ। ইউরোপের বিশেষ ঐতিহাসিক পটভূমিকায় এই মতবাদের জন্ম। এই শব্দটির নির্বিচারে প্রয়োগ কি সমাজবিজ্ঞানসম্মত? বাংলাদেশ কী ভাবছে? বাঙালি জাতীয়তাবাদ না বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ? দেশ বিদেশের সমাজবিজ্ঞানীরা জাতীয়তাবাদ ধারণাটির অপপ্রয়োগ বিষয়ে নানাধরণের তর্ক-বিতর্ক - প্রতর্কে মেতেছেন।

।।পটভূমি।।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গের প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয়েছিল ১৮৬০ সালেই। ওই বছরেই বঙ্গদেশের জেলাগুলির পুনর্বন্টনের প্রস্তাব দিয়েছিল কমিশন নিপুণ প্রশাসনের স্বার্থে। নীলকরদের অত্যাচার ছিল দুঃসহ। দূর দূরান্তে গ্রামাঞ্চলে আইন শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছিল। তাই দক্ষ প্রশাসনের জন্য প্রয়োজন ছিল পুনর্বিন্যাস। কিন্তু জেলাগুলির পুনর্বিন্যাসের ফলে বঙ্গদেশের জাতিগত, ভাষাগত, সাংস্কৃতিক এবং ভৌগোলিক ঐক্য বিনষ্ট হয়নি।

১৮৭৪ সালে অসমকে বিচ্ছিন্ন করা হল বঙ্গদেশ থেকে। শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া - এই তিনটি বঙ্গভাষাভাষী জেলা অসম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হল। একটি পৃথক শাসিত অঞ্চল হিসাবে অসমকে ন্যস্ত করা হল একজন চিফ কমিশনারের অধীনে। তখন অমৃতবাজার পত্রিকা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হত। তিনটি বঙ্গভাষী অঞ্চলের অসমভুক্তির তীব্র নিন্দা প্রকাশিত হল অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে। তখন বঙ্গদেশে সংগঠিত জনমত বলতে বিশেষ কিছুই ছিল না। বাঙালি মানসেও একাত্মবোধ গড়ে ওঠেনি।

১৯৮১ সালে উত্তর -পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে একটি আলোচনা সভা বসে। আলোচনায় অংশগ্রহন করেন লেফটেন্যান্ট গভর্ণর অব বেঙ্গল, চিফ কমিশনার্স অব বার্মা অ্যাণ্ড আসাম এবং কয়েকজন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার। এই সভা প্রস্তাব করে যে লুশাই হিলস এবং চিটাগং ভিডিশনকে আসামের অন্তর্ভুক্ত করা হোক। তখন অবশ্য এই প্রস্তাব কার্যকর হয়নি। ১৮৯৬সালে আসামের তৎকালীন চিফ কমিশনার উইলিয়াম ওয়ার্ড (William Ward) অসমের সঙ্গে চিটাগং ডিভিশনকে যুক্ত করার জন্য বিশদ প্রতিবেদন পেশ করেন। ওই বছরেই ওয়ার্ড এর স্থলাভিষিক্ত হন এইচ জে এস কটন (H.J.S. Cotton)। তিনি ওয়ার্ড -এর প্রস্তাব নাকচ করে দেন। লুশাই হিলস কিন্তু আসামের সঙ্গে যুক্ত হয়।

।।বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব।।

১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রচারিত ভারত - সরকারের একটি চিঠিতে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব সুস্পষ্ট অবয়ব পায়। চিটাগং ডিভিশন এবং ঢাকা ও ময়মনসিং জেলাকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব ছিল এই চিঠিতে। বঙ্গদেশ ও আসামের মধ্যে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক সীমারেখা হবে ব্রহ্মপুত্র, এই ছিল প্রস্তাবের সারকথা। কার্জন - সরকারের মূল প্রস্তাব ছিল মাদ্রাজ, সেন্ট্রাল প্রভিন্স এবং বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির কয়েকটি জেলার পুনর্বন্টন। এই প্রস্তাব প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে অন্তত ৫০০টি প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হয় শুধুমাত্র পূর্ববঙ্গ অঞ্চলে। ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার প্রতিবাদ করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন বিখ্যাত ব্যারিস্টার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী। লর্ড কার্জন মাদ্রাজ প্রদেশের জেলাগুলির পুনর্বন্টনের প্রস্তাব ত্যাগ করেন। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের অনুকূলে জনমত সৃষ্টির জন্য তিনি বক্তৃতা করেন পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। ঢাকার নবাব সলিমুল্লা প্রথম দিকে ছিলেন বঙ্গভঙ্গের বিপক্ষে। পরে তিনি কার্জনের প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। নিদারুণ অর্থাভাবে তিনি ছিলেন পীড়িত। ভারত সরকারের রাজকোষ থেকে এক লক্ষ পাউণ্ড তাঁকে কর্জ দেন কার্জন। ১৮০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মুম্বাই অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে উদ্বেগ ও নিন্দা প্রকাশ করে একটি মর্মস্পর্শী প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন হেনরি জে এস কটন। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন ফরিদপুরের অম্বিকাচরণ মজুমদার এবং সমর্থন করেন আশুতোষ চৌধুরী এবং বহরমপুরের বৈকুন্ঠ নাথ সেন। প্রস্তাবে বলা হয় সুশাসনের জন্য প্রয়োজন বঙ্গভঙ্গ নয়, আমলাতন্ত্রের উপর - কাঠামোতে রদবদল।

বঙ্গভঙ্গ প্রশ্নে ভারত - সরকারের হোম ডিপার্টমেন্টের বিশদ প্রস্তাব প্রকাশিত হয় ১৯০৫ সালের ২০ জুলাই। প্রস্তাবটি অনুমোদন করেন তৎকালীন সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ইনডিয়া মি. বডরিক (Mr. Brodrick)। বডরিক ছিলেন কার্জনের সহপাঠী, কিন্তু কর্মজীবনের তাঁদের মধ্যে সুসম্পর্ক ছিলনা। তা সত্ত্বেও প্রস্তাবটিকে তিনি সমর্থন করেন।

১৩টি অনুচ্ছেদে প্রস্তাবটি বিভক্ত। প্রস্তাবের ৭নং অনুচ্ছেদে মূল পরিবর্তন বর্ণিত হয়েছে। একজন লেফটেন্যান্ট - গভর্নরের মর্যাদাসম্পন্ন একটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করা হবে। বঙ্গদেশের চিটাগং, ঢাকা এবং রাজশাহী ডিভিশন, মালদহ জেলা, দি স্টেট অভহিল টিপেরা •Tipperah/ Tripura) এবং বর্তমান অসম চিফ্ কমিশনারশিপ। দার্জিলিং বঙ্গদেশের মধ্যেই থাকবে। উভয় অঞ্চলের মধ্যে সংযোগ সংরক্ষণের বিশেষ মূল্য আছে। এ কারণে প্রদেশের নাম হবে ইস্টার্ণ বেঙ্গল অ্যাণ্ড অসম। রাজধানী হবে ঢাকা এবং অতিরিক্ত সহায়ক সদর দফতর হবে চিটাগং। নতুন প্রদেশের এলাকা হবে ১০৬,৬৪০ বর্গমাইল। জনসংখ্যা ৩১ মিলিয়ন। এর মধ্যে মুসলমান ১৮ মিলিয়ন এবং হিন্দু ১২ মিলিয়ন। একটি লেজিসলেটিভ কাউন্সিল এবং ২ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি বোর্ড অব রেভিনিউ থাকবে। কলকাতা হাইকোর্টের এলাকা থাকবে অপরিবর্তিত। এসব কিছুর ফলে বঙ্গদেশের এলাকা হল সঙ্কুচিত। কিন্তু সম্বলপুর ও উড়িষ্যার ৫টি দেশীয় রাজ্য যুক্ত হল বঙ্গদেশের সঙ্গে। ফলে বঙ্গদেশের এলাকা হল ১৪১,৫৮০ বর্গমাইল। জনসংখা ৫৪ মিলিয়ন। হিন্দুর সংখ্যা ৪২ মিলিয়ন এবং মুসলমান ৯ মিলিয়ন। এই প্রস্তাবে আশা প্রকাশ করা হল, বঙ্গদেশ ও অসম দুটি সুসমঞ্জস প্রদেশ হিসাবে গড়ে উঠবে। এই দুটি প্রদেশের সীমারেখা এখন সুনির্দিষ্ট। উন্নত প্রশাসনের পূর্ণ উপকরণ তাদের করায়ত্ত। প্রস্তাবটি কার্যকর হয় ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর। বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করেন স্বয়ং সম্রাট পঞ্চাশ জর্জ ১৯২২ সালের ১২ ডিসেম্বর দিল্লি - দরবারে। ওই দিন ভারতের রাজধানী আনুষ্ঠানিকভাবে কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয়। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি স্মারকলিপি রচনা করেন।

রচনার কাজে তাঁকে সাহায্য করেন অম্বিকাচরণ মজুমদার। স্মারকলিপিটি ছিল অতি গোপনীয় দলিল। বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় গোপনে সহি - সংগ্রহের জন্য দলিলটি পাঠান হয়। ২৫টি জেলার মধ্যে ১৮টি জেলা থেকে সই সংগৃহীত হয়েছিল। ১৯১১ সালের জুন মাসের শেষের দিকে দলিলটি পাঠায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে। ঐ বছরেই ২৫ আগষ্ট ভারত সরকার একটি বিবৃতিতে সংশোধন অনুমোদন করে। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন, স্মারকলিপির মূল যুক্তি সরকারি বিবৃতিতে প্রতিফলিত হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ - বিরোধী আন্দোলনে সুরেন্দ্রনাথকে লণ্ডনে বিপুল সাহায্য করেন এ. ও. হিউম, উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ (Wedderburn), হেনরি কটন, জন ডিলকে (John Dilke) এবং র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড (Ramsay MacDonald)। একই উদ্দেশ্যে জন মর্লে (John Morle) -এর সঙেঘও সুরেন্দ্রনাথ আলাপ - আলোচনা করেন। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটেও কিছু রদবদল ঘটেছে। লর্ড ক্রুই (Lord Crewe) হলেন সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া। ১৯১০ সালের নভেম্বর মাসে তাঁর চাকুরি মেয়াদ শেষ হবার আগেই, তাঁকে লণ্ডনে ফিরে আসতে বলা হল। অনুকূল পরিবর্তনের ইঙ্গিত লক্ষ্য করেই ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ভূপেন্দ্রনাথ বসুর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল পাঠাল লণ্ডনে বঙ্গভঙ্গ সংশোধন প্রসঙ্গে আলাপ - আলোচনার জন্য। এই আলাপ - আলোচনার কিছু সিদ্ধান্ত সন্নিবেশিত হয় সুরেন্দ্রনাথ রচিত স্মারকলিপিতে এবং দিল্লি - দরবারের সম্রাট পঞ্চম জর্জের ঘোষণায়।

।। ১৯০৫ - ১২ কালপর্বের তাৎপর্য।।

১৯০৫-১২ কালপর্বে বঙ্গদেশের ঘটনাপ্রবাহ বিচার বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি প্রবণতা দৃষ্টিগোচর হয়। প্রবণতাগুলি দীর্ঘস্থায়ী। প্রথমত, রাখীবন্ধনের উষ্ণ আবেগ দ্রুত মিলিয়ে গেল। গভীরভাবে মানুষের মনে গেঁথে গেল মুসলমান প্রধান পূর্ববঙ্গ এবং হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গ। ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র প্রচার করেছে বঙ্গভঙ্গ ছিল মূলত প্রশাসনিক ব্যবস্থা। কিন্তু ধর্মসম্প্রদায় ভিত্তিক বিভাজননীতিই স্পষ্ট ব্যক্তহল ১৯০৫ সালে। ১৯৪৭ সালের ভারত - বিভাগ পর্যন্ত তা সক্রিয় ছিল। মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা প্রখর হয়েছে। পূর্ববঙ্গে বিত্তশালী হিন্দুরা আশঙ্কাপীড়িত। এখানে - ওখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়েছে। প্রাধান্য বেড়েছে ঢাকা শহরের। পূর্ববঙ্গের অনুন্নত অবহেলিত জেলাগুলি সরকারি কৃপাদৃষ্টির জন্য ব্যাকুল।

দ্বিতীয়, ১৯০৯ সালের সংস্কার আইন সাম্প্রদায়িক বিভাজনে ইন্ধন জুগিয়েছে। ওই আইন - অনুসারে বঙ্গদেশে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল -এ মোট নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ছিল ২৬, এর মধ্যে ৪টি আসন মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত ছিল। ইস্টার্ণ বেঙ্গল অ্যাণ্ড অসম প্রদেশে মোট নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ছিল ১৮, এর ৪টি আসন সংরক্ষিত ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য। আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা ১৯০৯ সালেই প্রথম চালু হল। এই বিভাজক আইনটি ইনডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্ট নামে পরিচিত। ১৯০৯ সালের ২৫ মে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত হয়। ওই বছরের ২২ মার্চ ইন্ডি য়ান অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ আইনটির নিন্দা করেন দৃপ্তভাষা বিবৃতির মাধ্যমে। শোনা যাক তাঁদের দূঢ়মনস্ক ভবিষ্যদ্‌বাচনঃ It will introduce division where there is none, and will emphasize and Perpetuate distinctions based on differences of religion and creed, rendering the growth of a politically – united Indian people impossible even in the distant future.

(বাংলা ভাষায় এর মর্মার্থ হল ঃ যেখানে বিভাজন নেই, সেখানে তা সৃষ্টি করা হবে। বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে যে পার্থক্যবা প্রভেদটাই পাবে স্থায়িত্ব। ফলে এমনকী সুদূর ভবিষ্যতেও রাজনৈতিক অর্থে ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় জনগণের বিকাশ অসম্ভব হয়ে পড়বে।) এই উপলব্ধি এখনও প্রাসঙ্গিক ও সত্যনির্ভর।

এই বিবৃতিতে যাঁরা সই করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন ঃ বৈকুণ্ঠনাথ সেন (বহরমপুর), আনন্দচন্দ্র রায় (ঢাকা),মতিলাল ঘোষ (কলকাতা), অম্বিকাচরণ মজুমদার (ফরিদপুর,) যাত্রামোহন সেন (চিটাগং), অনাথবন্ধু গুহ (ময়মনসিং), এ. চৌধুরী(পাবনা), কিশোরীমোহন চৌধুরী (রাজশাহী), জে. চৌধুরী (কলকাতা), নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত (বরিশাল), রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (২৪ পরগণা), ভূপেন্দ্রনাথ বসু (কলকাতা) এবং সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী।

তৃতীয়ত, ১৯৩০ সালের ৩০ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয় অল - ইণ্ডিয়া মুসলিম লিগ। এটি প্রবণতা নয়। এটি অতি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের সুপরিকল্পিত আন্দোলনের পরিণাম হিসাবে অভ্যুদিত হয়েছে প্রথমে পাকিস্তান এবং পরে বাংলাদেশ। বঙ্গভঙ্গের ক্রান্তিলগ্নে মুসলিম লিগের জন্ম। ভারত - বিভাগে তার সফল পরিণতি।

কিছু প্রাক্‌কথন প্রয়োজন। ১৮৫৮ সালে সৈয়দ আহ্‌মেদ খাঁ ছিলেন উত্তর প্রদেশের মোরদাবাদ জেলার সাব - জাজ। সে সময় তিনি 'The Causes of the Indian Revolt' শিরোনামে একটি পুস্তিকা লেখেন। তখনও সিপাহি বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সম্পূর্ণ নেভেনি। বিদ্রোহের কারণ বিশ্লেষণ করে তিনি জানালেন, সাধারণ মানুষের অনুভূতি - উপলব্ধি সম্পর্কে সরকার এতটুকুও অবহিত নন। কারণ গভর্ণর - জেনেরেলের লেজিভলেটিভ কাউন্সিলে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের কোনো প্রতিনিধি নেই। তাঁর এই পুস্তিকার কথা বিশেষ কেউ জানত না। তাঁর বক্তব্য সুপ্রচারিত হয়নি। মাত্র ৫০০ কপি বই তিনি ছাপিয়েছিলেন। এর মধ্যে ৪৯৮ কপি তিনি পাঠান লণ্ডন শহরের নানা বিদগ্ধ মানুষের কাছে। ভারত - সরকারের কাছে পাঠান এক কপি এবং নিজের কাছে রাখেন এক কপি। ওই পুস্তিকার একটি কপিও প্রচারিত হয়নি ভারতবর্ষে। ১৮৭৮ সালে লর্ড লিটন সৈয়দ আহমেদকে সুপ্রিম লেডিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য করে নেন। ১৮৪১ সালেওই পদে তাঁকে পুনরায় নিযুক্ত করেন লর্ড রিপন। ১৮৮৩ সালের ১২ জানুয়ারি সেন্ট্রাল প্রভিন্সেস লোকাল সেল্ফ - গভর্ণমেন্ট বিল সম্পর্কে আলোচনার সময় তিনি সারগর্ভ ভাষণ দেন। এই ভাষণে তাঁর নিজস্ব মতামত সুব্যক্ত হয়েছে। এই ভাষণ থেকেই পরবর্তীকালে মুসলিম লিগ মতাদর্শগত প্রেরণা পেয়েছে। সৈয়দ আহমেদ বলেছিলেনঃ But, my lord, in a country like India, where caste distinctions still flourish, where there is no fusion of various races, where religious distinctions are still violent, where education in its modern sense has not made an equal or proportionate progress among all the sections of the population, I am convinced that the introduction of the principle of election, pure and simple, for representation of various interests on the local boards and district councils, would be attended with evils of greater significance than purely economic considerations.

(বাংলাভাষায় তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম হল ঃ ভারতবর্ষে জাতিবর্ণভেদ (caste অর্থে) এখনও জাজ্বল্যমান। বিভিন্ন জাতির (race অর্থে) মধ্যে সাঙ্গীকরণ ঘটেনি। ধর্মীয় পার্থক্য হিংসাপ্রবণ আধুনিক অর্থে শিক্ষা ভারতবাসীর সমস্ত অংশের মধ্যে সমানভাবে বা আনুপাতিকহারে প্রসারিত হয়নি। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস এই যে, আঞ্চলিক বোর্ড বা জেলা কাউন্সিলে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের জন্যঅবিমিশ্র নির্বাচননীতি চালু হলে, তার ফলাফল হবে অতিমাত্রায় হানিকর।)

১৮৮৫ সালে গঠিত হয়, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। কিন্তু কংগ্রেসকে সৈয়দ আহমেদ জাতীয় প্রতিষ্ঠান মনে করতেন না। তাঁর যুক্তি হল রাজপুত, মুসলমান, গোর্খা এবং শিখ প্রমুখ ভারতের সামরিক জাতিগুলি (race অর্থে) কংগ্রেসের মধ্যে ছিল না। তাছাড়া উত্তর ভারতের হিন্দুরা কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন আন্দোলন সম্পর্কে নিস্পৃহ ছিল। ১৮৮৮ সালের আগস্ট মাসে তিনি গড়ে তোলেনপ্যাট্রিওটিক অ্যাসোসিয়েশন এবং ১৮৯৩ সালে আপার ইণ্ডিয়া ডিফেন্স অ্যাসোসিয়েশন অব দ্য মহামেডান্স। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি মারা যান। এ-দু'টি সংগঠনও বিলুপ্ত হয়।

কেন মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী ছিল, সেসব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিগের প্রতিষ্ঠাতৃগণ সৈয়দ আহমদকে স্মরণ করেছেন কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁদের বরেণ্য পূর্বসূরিরূপে। একারণে এখানেও তাঁর প্রসঙ্গ এসেছে অনিবার্যভাবে। ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর সিমলাতে মুসলমান নেতৃবর্গের একটি প্রতিনিধিদল দেখা করেন ভাইসরয়ের সঙ্গে। তাঁকে প্রতিনিধিবৃন্দ জানান, ভারতের অন্যান্যসম্প্রদায়ের সঙ্গে যথেষ্ট মিল থাকা সত্ত্বেও এখানকার মুসলমানরা একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় (a distinct community)। ভাইসরয়ের সঙ্গে মুসলিম ডেপুটেশনের সাক্ষাৎকারের পরেই গঠিত হয় ভারতীয় মুসলমানদের নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন। ১৯৩০ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকার নবাব সলিমুল্লার প্রথম প্রস্তাব মতো ঢাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয় অল - ইণ্ডিয়া মুসলিম লিগ। মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠার বিঘোষিত লক্ষ্য ছিল তিনটি ঃ ১) ভারতীয় মুলমানদের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যবোধ সম্প্রসারিত করা; ২) ভারতীয় মুসলমানদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ ও পরিবর্ধন করা এবং তাদের প্রয়োজন এবং আশা - আকাঙক্ষাব্রিটিশ সরকারের কাছে শ্রদ্ধার সঙ্গে নিবেদন করা; ৩) অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের বিরোধবিদ্বেষ প্রতিরোধকরা।

দিল্লির হাকিম আজমল খাঁ সাহেব এবং হায়দ্রাবাদের জাফল আলি প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। সর্বসম্মতভাবে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

দ্বিতীয় প্রস্তাব অনুসারে মুসলিম লিগ -এর গঠনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য একটি অস্থায়ী কমিটির সদস্যগণের নাম ঘোষণা করাহয়। অঞ্চল ভিত্তিক সদস্যসংখ্যা হল ঃ পূর্ববঙ্গ ৩, অসম - ১, পশ্চিমবঙ্গ -৬, বিহার-৩, আউধ - ৮, আগ্রাপ্রদেশ-১৩, পাঞ্জাব-৭, সীমান্তপ্রদেশ-২, সিন্ধু-১, কাথিওয়াড-১, গুজরাট-১, বোম্বে-৩, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি-৫, উড়িষ্যা-১, সেন্ট্রাল প্রভিন্সেস -২, বর্মা-৩, মোট সংখ্যা -৬০। এঁদের মধ্যে ২৯ জন ছিলেন আইনজীবী, বেশ কয়েকজন নবাব এবং পত্রিকা-সম্পাদক। তালিকাটি বিশ্লেষণ করলে দু'টি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। প্রথমত, সদস্যগণ উচ্চবর্গীয় শ্রেণিভুক্ত। দ্বিতীয়ত, উভয়বঙ্গের প্রাধান্য তুলনামূলক বিচারে অতিক্ষীণ। প্রাধান্য পেয়েছে আউধ, আগ্রাপ্রদেশ ও পাঞ্জাব।

মুসলিম লিগ-এর ঢাকা সম্মেলনের চতুর্থ প্রস্তাবে বলা হয়েছে, বঙ্গভঙ্গ নিঃসন্দেহে পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অর্থাৎমুসলমান সম্প্রদায়ের স্পষ্ট স্বার্থের অনুকূল এবং তাদের পক্ষে মঙ্গলদায়ক। এই প্রস্তাবে বয়কট আন্দোলনকে কঠোরভাষায় নিন্দা ওনিরুৎসাহিত করা হয়। এই প্রস্তাবও ছিল সর্ববাদী সম্মত। প্রস্তাবগুলির প্রতিলিপি পাঠানো হয় ৩০

ডিসেম্বর ভাইসরয়কে এবং ৩১ ডিসেম্ফর গভর্ণমেন্ট অভ ইণ্ডিয়া, হোম ডিপার্টমেন্ট - এর সেক্রেটারিকে ও গর্ভণমেন্ট অভ ইস্টার্ণ বেঙ্গল অ্যাণ্ড অসম -এর চিফ্ সেক্রেটারিকে। যে -সব মুসলমান নেতৃবৃন্দ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন উর্দুভাষী। আলোচনার সময়তাঁরা দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন, ভারতের সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের সমগ্র স্বার্থের প্রবক্তা হিসাবে মুসলিম লিগ-ই একমাত্র সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। মুসলিম স্বার্থের রক্ষার হিসাবে আগা খাঁ লণ্ডনে প্রচার করেছেন ধর্মসম্প্রদায়ভিত্তিক স্ফতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থার পক্ষেযুক্তি বিন্যাস। ১৯০৫-১২ কালপর্বে আলোচনা এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী পর্যায়ে আছে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কিছু নির্বাচিত ঘটনাবলির রেখাচিত্র। সমসাময়িক কিছু প্রশ্ন মনে রেখে অতি সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র এঁকেছি।

।। জিন্না উবাচ।।

পাকিস্তানের করাচিতে অবস্থিত কায়েদ -ই-আজম একাডেমি মহম্মদ আলি জিন্নার জীবনচরিত ও কর্মধারা সম্পর্কে একটি অতি উচ্চমানের গবেষণাকেন্দ্র এখান থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত হয়েছে Quaid-i-Azam and His Times : A Compendium গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড। জিন্নার জীবনের ১৮৭৬-১৯৩৭ কালপর্ব এই গ্রন্থে বিধৃত। গ্রন্থটি সম্পাদনা করছেন সরিফ আল মুজাহিদ। গ্রন্থটির মোট ৫৫০ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হয়েছে ৫৫০০ বিষয় (item)। জিন্নার জন্মলগ্ন থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত তাঁর জীবনধারা সন-তারিখ কালানুক্রমে পরিবেশিত হয়েছে। পড়বার সময় মনে হয়, তাঁর জীবনের প্রতিদিনের দিনলিপি আমার দৃষ্টির সামনে উদ্ভাসিত। দিনলিপি মনে করেই এই মহাগ্রন্থ থেকে আমি তথ্য চয়ন করেছি। ১৯৯১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে এসে গ্রন্থটি আমাকে উপহার দেন স্বয়ং ড. ওয়াহিদ আহমদ। কায়েদ ই-আজম একাডেমির তৎকালীন ডিরেক্টর। তাঁর প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ। ওই গ্রন্থ থেকে কয়েকটি নির্বাচিত ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি।

১৯২৮ সালের ২৮ ডিসেম্ফর। জাতীয় কংগ্রেসের আহ্বানে সর্বদলীয় বৈঠক বসেছে নেহেরু রিপোর্ট আলোচনার জন্য। মুসলিম লিগের প্রতিনিধিত্ব করেছেন জিন্না। তিনি সংশোধনী প্রস্তাবে বললেনঃ ১। কেন্দ্রে মুসলমানদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধিত্বথাকবে। ২। যদি সর্বজনীন বয়স্ক ভোটাধিকার ইতিমধ্যে চালু না হয়, তাহলে পাঞ্জাব ও বঙ্গদেশে দশ বছরের জন্য মুসলমান সদস্যপদ সংরক্ষিত রাখতে হবে। ৩। শাসনতন্ত্রের বিধানে অবশিষ্ট ক্ষমতা (residuary power) থাকবে প্রদেশগুলির হাতে। ৪। প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার স্বার্থে মাঝে-মাঝেই কেন্দ্র ও প্রদেশের হাতে ন্যস্ত ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস করতে হবে। সর্বদলীয় বৈঠকে প্রাধান্য ছিল হিন্দু মহাসভা ও শিখ লিগ-এর সদস্যবৃন্দের। তাঁদের বিরোধিতায় জিন্নার সংশোধনী প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার জিন্নার আছে কিনা, সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন জয়াকর।তেজ বাহাদুর সপ্রু তাঁকে 'spoilt child' বলে তিরস্কার করেন। প্রচণ্ড প্রতিরোধ সত্ত্বেও শান্তস্ফরে জিন্না জানান তিনি সর্বদলীয় বৈঠকে যোগ গিয়েছেন একজন ভারতীয় হিসাবে, মুসলমান হিসেবে নয় (not as a Musalman, but as an Indian) তিনি আরও বলেনঃ "What we want is that Hindus and Muslims should march together until our object is obtained. Therefore, it is essential that you must get not only the Muslim League but the Musalmans of India…Do you want or do we no want the Muslim India to go along with you?" তাঁর বক্তব্যের ভাবানুবাদ হল ঃ (আমরা যা চাই তা হল আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত হিন্দু ও মুসলমান একই সঙ্গে পথ চলবে। সুতরাং এটা জরুরি যে মুসলিম লিগকে পেলেই হবে না, ভারতের মুসলমানদেরকেও পেতেহবে। ... আপানারা চান কি চান না যে মুসলিম ভারত একসঙ্গেই আপনাদের সহযাত্রী হবে?) ১৯৩৬ সালের ১৭ থেকে ২৫ আগস্ট জিন্না কলকাতায় ছিলেন। ফজলুল হক ও খাজা নাজিমুদ্দিন প্রমুখ বঙ্গদেশের মুসলিম নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তিনি আলাপ আলোচনা করেন। তিনি চেয়েছিলেন আগামী নির্বাচনে ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি, কৃষক প্রজা পারটি এবং মুসলিম লিগ যৌথভাবে একত্রে নির্বাচনে অংশ নিক। এজন্যতাঁরই উদ্যোগে সর্বসম্মতভাবে গঠিত হয়েছিল ১৫ জন সদস্য বিশিষ্ট মুসলিম লিগ পালামেন্টারি বোর্ড। সংশ্লিষ্ট মুসলিম দলগুলি এবং নির্দলীয় মুসলিম গোষ্ঠীসমূহ সম্মত হয়েছিল যে মুসলিম লিগ পার্লামেন্টারি বোর্ড-এর নিয়মাবলি মেনেই নির্বাচনে অংশ নেবে। কিন্তু জিন্না কলকাতা ছেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ফজলুল হক কৃষক প্রজা পারটি ভেঙে দিতে আপত্তি জানান। যৌথ চুক্তি মানতেও তিনিঅস্বীকার করেন।

২০ আগস্ট কলকাতার টাউন হলে তাঁকে বাংলার মুসলমানদের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের অনগ্রসরতার জন্য তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, মুসলিম লিগই তাদের একমাত্র প্রতিনিধিমূলক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। মুসলিম লিগ পার্লামেন্টারি বোর্ড -এর নীতি ও নির্দেশ মতো নির্বাচনে অংশ নিতে তিনি প্রত্যেক মুসলমানকে আহ্বান জানান। অন্যান্য সম্প্রদায়কে তিনি বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁর ভাষণে এই মনোভাব সুব্যক্ত ঃ "Ours is not a hostile movement; ours is a movement which carries the olive branch to every sister community."

২১ আগস্ট কলকাতার নাখোদা মসজিদে তিনি জুম্মার নমাজ পড়েন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষ হলে একটি বিশাল ছাত্রসভায় তিনি ভাষণ দেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। তাঁর ভাষণেতিনি বলেন, সমস্ত সম্প্রদায়ের বিশেষ করে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের ঐক্যের মধ্যেই নিহিত ভারতের মুক্তি (India's salvation lies in the unity of all communities specially Hindus and Muslims.)। ১৯৩৭ সালের ২৩ অশোবর তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরে আসেন। তিনি এখানে অল বেঙ্গল মুসলিমকনফারেন্স -এ সভাপতিত্ব করেন। তাঁর ভাষণে তিনি বিশ্লেষণ করেন কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের নীতি ও কার্যধারার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য। ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্রে মুসলমানদের অধিকার ও স্বার্থের সংরক্ষণ তিনি দাবি করেন। ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষা নিয়ে অনেককিছু বলা যায়। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতাই প্রকৃতক্ষমতা, রাজনৈতিক ক্ষমতাই আমাদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষার রক্ষাকবচ (you may talk as much as you like about your religion culture and language. Political power is a power that will safeguard our religion, culture and language.)।

এ বিষয়ে কংগ্রেসের বক্তব্য হল, ভারতের হিন্দু ও মুসলমান ক্ষুধা ও দারিদ্র্যে জর্জরিত। সুতরাং অর্থনৈতিক প্রশ্নটাই মূলপ্রশ্ন। জিন্নার মতে কংগ্রেসের বক্তব্য অসৎ। এতে কিছু আসে যায় না। সংখ্যালঘু সমস্যাকেও কংগ্রেস সমস্যা মনে করে না। কানাডা,চেকোশ্লোভাকিয়া, পোলাণ্ড, মিশর প্রভৃতি পৃথিবীর অন্যান্য দেশ সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান করেছে। কিন্তু কংগ্রেস বলে, এ ধরণেরকোনও সমস্যাই নেই। তাঁদের বক্তব্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিশ্বাস করবে সংখ্যা গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সদিচ্ছা ও ন্যায়বোধের দ্বারা পুষ্ট আচরণকে। মাকড়সা জাল বিছিয়ে মাছিকে ডাকছে। সে-জালে জড়িয়ে পড়লে মাছির সর্বনাশ। জিন্না তাই সতর্ক করতে চান মুসলমানসম্প্রদায়কে। বহরমপুরের সভায় তিনি বলেছেনঃ "Today the entire burnt of attack is on me because I am attempting to prevent the spider making the fly to walk into his parlor."

এই সভায় বক্তৃতা করেন ফজলুল হক, নাজিমুদ্দিন এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কাজেম আলি মির্জা। আলোচ্য গ্রন্থে বহরমপুরের অবস্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে ইস্টবেঙ্গল। এ-ভ্রান্তি কেন ঘটল, তা স্পষ্ট নয়।

।। ভারতবিভাগ ঃ তারবেলা।।

বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) এবং ভারতবিভাগ (১৯৪৭)-এই দুই ঘটনার মধ্যে তুলনাত্মক আলোচনা সমীচীন নয়। বঙ্গভঙ্গ ছিল স্বল্পকালীন ব্যবস্থা। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে বিশ্বপরিস্থিতিতে অভাবনীয় রূপান্তর ঘটে। প্রতি দেশই প্রভাবিত হয় রূপান্তরের অভিঘাতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে তৃতীয় বিশ্বের পরাধীন দেশগুলিতে স্বাধীনতা আন্দোলন বেগবান হয়। ত্বরান্বিত হয় ভারতবিভাগ ও ভারতের স্বাধীনতা বা ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া। ১৯৪২ সালে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু করেন দেশজুড়ে। কেনতিনি এই চরম সিদ্ধান্ত নিলেন, সে-সম্পর্কে ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের প্রতিবেদনে কয়েকটি অনুমানভিত্তিক কারণ দেখানো হয়েছে যথা, ১) গান্ধী - নির্দেশিত ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের ব্যর্থতা , ২) ক্রিসপ মিশনের ব্যর্থতা (মার্চ-এপ্রিল ১৯৪২), ৩। ভারতের সীমান্তে বিজয়ী ও আগ্রাসী জাপানের উপস্থিতি, ৪। যুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষে তখন কোনও প্রস্তুতি গড়ে ওঠেনি, ৫। এ বিষয়ে হরিজন পত্রিকায় ১২ এপ্রিল তারিখে প্রবন্ধ লিখেছিলেন মহাদেব দেশাই। ৬)১৯৪২ সালের মার্চ মাসে মার্কিন সেনাবাহিনী ভারতবর্ষে পৌঁছে গেছে। ৭) পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি ব্রিটিশ রাজশক্তি হয়ত মেনে নেবে। ভারতীয় ঐক্যের পক্ষে তা হবে বিপজ্জনক।

আর. এস. রুইকর কলকাতায় হেমন্তকুমার বসুকে একটি চিঠি লেখেন। এই চিঠিতে তিনি জানান মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেস ওয়াকিংকমিটি তখন সুভাষচন্দ্র বসু ও অল - ইণ্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক - এর পথই অনুসরণ করেছে। কিন্তু একথাও সত্য ব্রিটিশ প্রভুত্বের বদলে জাপানি প্রভুত্ব গান্ধীজী কিছুতেই মেনে নেবেন না। একারণে তিনি স্বাধীনতার জন্য আশু সংগ্রামের ডাকও দিয়েছেন।

১৯৪০ সালে গৃহীত হয় মুসলিম লিগ-এর পাকিস্তান প্রস্তাব। স্লোগান ছিল লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। এই লড়াই ব্যাপক রূপ নিল ১৯৪৬ সালে ১৬ আগস্ট কলকাতা শহরে।

একে বলা হয়েছে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। স্টেটসম্যান পত্রিকার ভাষায় 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'। পাঁচদিন চলেছিল প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। কেউ কেউ বলেন চার হাজার মানুষ নিহত হয়েছিল প্রত্যক্ষ সংগ্রামে। কারও মতে ছয় হাজার। কলকাতা থেকে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে নোয়াখালি, বিহার ও মুম্বাই শহরে। মানসিকভাবে গোটা দেশ ভাগ হয়ে গেল হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে। ভারতবিভাগ ছিল অনিবার্য।

ক্রিসপ প্রস্তাব ব্যর্থ হলে রাজা গোপালচারি ভারতভাগের প্রস্তাব দেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ছিল পাকিস্তানের সমর্থক। কলকাতার রাস্তায় মুসলিম লিগ ও কম্যুনিস্ট পার্টি একসঙ্গে মিছিল করেছে পাকিস্তান দাবির সমর্থনে। উভয় দলের পতাকা একসঙ্গে বেঁধে তারা পথ চলেছে, পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়েছে। ভারতভাগের বিরোধিতা করেছে হিন্দু মহাসভা। কিন্তু এই দলের অন্যতম প্রধান নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বঙ্গবিভাগ প্রস্তাব করেছেন। প্রস্তাবের সমর্থনে তাঁর অনুগামীরা কলকাতার রাস্তায় সহি - সংগ্রহের অভিযানে নেমেছিল। তৎকালীন অমৃতবাজার পত্রিকার এক 'গ্যালপ পোল' -এ জানা যায়, ৯৮.৩ শতাংশ বাঙালি হিন্দুছিল বাংলা বিভাগের পক্ষে।

মিলনের প্রেরণাও একেবারে বিলীন হয়ে যায়নি। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বাঙালি। আজাদ হিন্দ ফৌজের কীর্তিকাহিনী ঘিরে বাঙালির ছিল গর্বের আবেগ। ক্যাপ্টেন শাহনওয়াজ, গুরুব' সিং ধীলন ও সাইগলের বিচার হয় দিল্লির লালকেল্লায়। শাহনওয়াজ ছিলেন মুসলমান, ধীলন শিখ, এবং সাইগল হিন্দু। শাহনওয়াজ দিবস পান করা হল। হরতালে সামিল সব ধর্মের, সব সম্প্রদায়ের এবংসব শ্রেণীর মানুষ। ক্যাপ্টেন রসিদ আলি বিচারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। প্রতিবাদে পালিত হয় রসিদ আলি দিবস। অগণিত মানুষের মিছিল মিলিত হয় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। মিছিলে নেতৃত্ব দেন শরৎচন্দ্র বসু এবং সৈয়দ সুরাবর্দি। বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত তাই অনেক কলকারখানা অফিস বন্ধ করে দেওয়া হল। তখন সমস্ত রাজনৈতিক দলের শ্রমিক নেতারা সংঘবদ্ধ ছিলেন একটি মাত্র কেন্দ্রীয় শ্রমিকসংগঠন এ আই টি ইউ সি-র পতাকাতলে। এই শ্রমিক সংগঠন ১৯৪৬ সালের ২৯ জুলাই বাংলাবন্ধ ডাকে ছাঁটাই-এর বিরুদ্ধে। শ্রমিকনেতা বিমল কুমার ব্যানার্জী লিখেছেন, সে এক অভূতপূর্ব কাণ্ড, উন্মাদনাপূর্ণ। সব বন্ধ কলকারখানা, অফিস- আদালত, দোকান-স্কুল-কলেজ বাস -ট্রাম সব বন্ধ সভাসমিতি, বিবৃতি দিয়ে সংগঠন করার প্রয়োজন হয়নি। বন্ধ সকল মানুষের স্বেচ্ছায় যোগদানে।বিদেশী সরকারের নীতির প্রতিবাদে এবং শাসন ক্ষমতা ত্যাগ করে চলে যাওয়ার দাবিতে বন্ধ। মানুষের নিজেদের আবেগেই এই বন্ধ সফল করে।

তাই বলছিলাম ঐক্যবন্ধন ছিল। নানাভাবে যথাসময় তা প্রকাশমান হয়েছে। এমনকী উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের মধ্যেও সামাজিক আলাপচারিতা বিনষ্ট হয়নি। তবু ভারতবিভাগ অর্থাৎ এক্ষেত্রে বঙ্গবিভাগ অনিবার্য হয়ে পড়ল। পাঞ্জাব ভাগ হয়েছে। যেখানে হত্যা ও ধ্বংসলীলা ছিল আরও হৃদয়বিদারক। কিন্তু বিশ্বে ও ভারতে পাঞ্জাবিরা এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। সমগ্র সিন্ধুপ্রদেশ পাকিস্তানে চলে যায়। সিন্ধু থেকে অনেকেই চলে আসে গুজরাটে। তাদের নিষ্ঠা ও পরিশ্রমে গড়ে উঠেছে গুজরাটের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি। কিন্তু ১৯০৫ ও ১৯৪৭ -এর বঙ্গবিভাগের স্মৃতির তাড়নায় বাঙালি সততই যন্ত্রণাকাতর।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেন্টস অ্যা* অনুসারে ভারতের ক্ষমতা হস্তান্তর ঘটে। স্বাধীন সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ওই আইনের তিন নম্বর ধারা অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ৩০ জুন গঠিত হয় বেঙ্গল বাউণ্ডারি কমিশন। এই কমিশনের সদস্য ছিলেন সিরিল র‍্যাডক্লিফ (Cyril Radccliffe), বিজনকুমার মুখার্জী, সি.সি. লবিশ্বাস, আবু সালে মহম্মদ আক্রাম এবং এস. এ. রহমান। ১৯৪৭ সালের ১৬ জুলাই থেকে ২৭ জুলাই পর্যন্ত কমিশনের অধিবেশন বসে। কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন র‍্যাডক্লিফ। তিনি সীমানা কমিশনের প্রতিবেদনপেশ করেন ১৯৪৭ সালের ১২ আগস্ট। উভয়বঙ্গের সীমানা নির্ণয় ছিল কমিশনের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব। মুসলমানপ্রধান ও অমুসলমান প্রধান সন্নিহিত অঞ্চলের ভিত্তিতে সীমানা বিভাজন করতে হবে। একাজে বিবেচনা করতে হবে অন্যান্য উপাদানও (To Demarcate boundaries of two parts of Bengal on the basis of ascertaining neighboring areas of Muslims and no – Muslims, taking into account other factors.)।

একাজ ছিল নিঃসন্দেহে সমস্যাকন্টকিত। বঙ্গপ্রদেশে প্রাকৃতিক সীমারেখা নেই বললেই চলে। মুসলমানপ্রধান ও অমুসলমানপ্রধান সন্নিহিত অঞ্চল হিসাবে বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিকাশ ঘটেনি। মুসলিম লিগের পক্ষে আইনজীবী ছিলেন হালিদুল হক চৌধুরী। তিনি 'ইউনিয়ন' ভিত্তিক লোকগণনা অনুসারে বিভাজন - নীতি নির্ণয় করার পক্ষে কমিশনের কাছে আর্জি পেশ করেছিলেন। ইউনিয়নগুলি গঠিত হয়েছিল ১৯১৯ সালের ভিলেজ সেল্ফ - গভর্ণমেন্ট অ্যা* অনুসারে। ইউনিয়ন - ভিত্তিক জনগণনার দলিল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট -এর দফতরে সীল - করা খামে রক্ষিত ছিল। জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে আইনজীবী ছিলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত। তিনি ইউনিয়ন ভিত্তিক জনগণনার ব্যাপারে আপত্তি জানান। কারণ এগুলি ছিল জনসাধারণের কাছে অজানা অগম্য। থানাভিত্তিক লোকগণনার দলিলগুলিকে ক্ষুদ্রতম একক হিসাবে গণ্য করার জন্য তিনি আর্জি পেশ করেন বাউণ্ডারি কমিশন - এর কাছে। ইউনিয়ন - মানচিত্র মুসলিম লিগ জোগাড় করেছে, কিন্তু কংগ্রেস ও অন্যান্য দল পায়নি। কমিশনের সদস্যরাও একই মানচিত্র পাননি। র‍্যাডক্লিফ তাঁর প্রতিবেদনে বলেছেন, নদীপথ ও রেলপথকে তিনি খণ্ডিত করতে চাননি। তবু কোথাও কোথাও অসঙ্গতি থেকে গেছে। তিনি আশাপ্রকাশ করেছেন, উভয়রাষ্ট্র এমন কিছু ব্যবস্থা নেবে যার মাধ্যমে এসবের সমাধান সম্ভব হবে। মাথাভাঙ্গা নদী সম্পর্কে তাঁর ধারণায়কিছু বিভ্রান্তি ছিল। ফলে নদীয়া জেলার মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা মহকুমার পাঁচটি থানা পশ্চিমবঙ্গ হারায়। এগুলি হল ঃ গঙ্গনি (১৩২বর্গমাইল), মেহেরপুর (১৪৪ বর্গমাইল), অলমডাঙ্গা (১৩৩ বর্গমাইল), চুয়াডাঙ্গা (১১২ বর্গমাইল), দামুরহুদা (১১৮ বর্গমাইল)। অর্থাৎ ৬৩৯ বর্গমাইল জায়গা পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য ছিল। কিন্তু মানচিত্র অঙ্কনের ভ্রান্তিতে তা পূর্বপাকিস্তানের অন্তর্গত হয়। নদীয়াবাসীর পক্ষ থেকে বারত - সরকারের কাছে প্রতিবাদপত্র পাঠান হয়। ১৯৪৮ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি বসন্তকুমার দাশ এবং ৩ মার্চ অরুণচন্দ্র গুহ এ বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন ভারতীয় পার্লামেন্টে। 'মেলেনি উত্তর'। ভারত - বিভাগ করেছিল দেশী - বিদেশী 'বুড়ো - খোকা'দেরদল। নাতনির প্রশ্ন ঃ /তোমরা তখন করছিলে কী ভাঙ্গল যখন বঙ্গ ?* দাদুর উত্তরঃ /আপন যদি পর হয় যায় ঘর হয়ে যায় ভঙ্গ।*) অন্নদাশঙ্কর রায়।